জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১১, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-জুন ২০২১

ধর্মের সমাজতত্ত্ব : প্রসঙ্গ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *লালসালু*

ফাতেমা-তুজ-জোহরা*

Abstract

Syed Waliullah is a pioneer writer of Bangladesh. His first published novel *Lalsalu* is also well-known for its illustration of grave-based religious superstitions and other social issues. In previous research, most of the researchers discussed and analyzed the rhetorical and historical aspects of this novel. Some of them also tried to discuss the form and unique impression of this novel. Sociological study of religion in literature is still a comparatively little explored field. It has an important role in literary criticism. But we haven't found any notable literary criticism of *Lalsalu* using the method of sociology of religion. In this paper, we have examined, how the sociological perspective of religion works in this fiction. We tried to relate various sociological theory of religion in the context of *Lalsalu.*

ভূমিকা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ (১৯২২-১৯৭১) বাংলাদেশের কথাশিল্পে একজন আলোকসঞ্চারী সাহিত্যিক। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত *লালসালু* তাঁর প্রথম উপন্যাস। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরে রচিত এই গ্রন্থে ধর্মকে আশ্রয় করে গড়ে উঠা সমাজের সীমাবদ্ধতা ও সংকটকে তীব্রভাবে উন্মোচন করেছেন লেখক। মূলত জীবন ও জগতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজনে বিভিন্ন সমাজে সৃষ্টি হয়েছে নানান ধর্ম। সৃষ্টিকালে প্রত্যেক ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল সমাজে শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপন করা। কালের বিবর্তনের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও জীবনাচরণে পরিবর্তন আসে। আবার বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের প্রয়োজনে ধর্মের ব্যাখ্যায় আনেন পরিবর্তন। বিশেষ করে সমাজে শিক্ষার আলো যখন থাকে সীমিত, সাধারণ মানুষের মাঝে তখন ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞানও থাকে সীমাবদ্ধ।

ফলে, সুযোগসন্ধানী অনেক ব্যক্তি ধর্মের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে সমাজে বিস্তার করেন আধিপত্য, থাকতে চান সুবিধাজনক অবস্থানে। *লালসালু* উপন্যাসেও মাজারবিশ্বাস ও পিরপ্রথাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিস্বার্থসিদ্ধির চিত্র আমরা পাই। *লালসালু*তে ধর্মের নামে ধর্মব্যবসার চিত্র নিয়ে নানান গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিত হলেও, এই উপন্যাসকে ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়নি। ধর্মের সমাজতত্ত্ব সমাজের উপর ধর্ম কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে কিংবা ধর্ম কিভাবে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে তা যেমন আলোচনা করে; তেমনি সমাজের মানুষের আচার-আচরণ, জীবনযাপন, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আর্থ-সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডে ধর্মের প্রভাব বিশ্লেষণেও গুরুত্ব প্রদান করে। সমাজতত্ত্বের একটি বিশেষ শাখা হিসেবে ধর্মের সমাজতত্ত্বের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সমালোচক বলেন:

> The phenomenon of religion attracted the attention of the sociologists because of its great human importance. No society is free from the influence

* সহকারী অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

> of religion. In established societies, religion is one of the most important institutional structures making up the total social system. A special branch of sociology has now emerged in order to analyse the religious behaviour of men from a sociological point of view.[1]

আমাদের এই প্রবন্ধে *লালসালু* উপন্যাসকে ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

লালসালু বাংলাদেশের সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। একই সঙ্গে উপন্যাসটির গুরুত্ব রয়েছে ধর্ম ও ধর্মভিত্তিক সমাজ বিশ্লেষণে। এই উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সমাজবিজ্ঞানীর মতো নিবিড় পর্যবেক্ষণে লালসালুকে নির্মাণ করেছেন। একথা অনস্বীকার্য যে, এই গ্রন্থকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে অনেক; কিন্তু সেসব সমালোচনায় মাজারকেন্দ্রিক ধর্মব্যবসার চিত্র বিশ্লেষিত হলেও, ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটকে গুরুত্ব দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পরিলক্ষিত হয়নি। বিভিন্ন গবেষণায় *লালসালু*র নান্দনিক দিক, নির্মাণশৈলী, শিল্পসাফল্য, প্রতীচ্যপ্রভাব ইত্যাদি বিশ্লেষিত হয়েছে। কোনো কোনো গ্রন্থে সমাজতাত্ত্বিক অভিনিবেশের ছোঁয়া থাকলেও তা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে ধর্মের সমাজবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতির প্রয়োগে লেখকদের সীমাবদ্ধতার কারণে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত *লালসালু*কেন্দ্রিক প্রবন্ধসমূহেও ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অভাব লক্ষণীয়। ফলে ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতকে গুরুত্ব দিয়ে *লালসালু* উপন্যাসের মূল্যায়ন করা জরুরি বলে আমাদের মনে হয়েছে। একারণে আমরা *লালসালু* উপন্যাসে প্রতিফলিত ধর্মের সমাজতত্ত্বকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছি এই প্রবন্ধে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লালসালু উপন্যাসে প্রতিফলিত ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট ও উপাদানকে মূল্যায়ন করা এই প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য। *লালসালু* উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ ও চরিত্রের অন্তর্গত সত্তায় ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক উপাদানসমূহ কীভাবে ক্রিয়াশীল থেকেছে, তা পরীক্ষা করে দেখাও প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

এই প্রবন্ধটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস নির্ভর একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। প্রাথমিক উৎস হিসেবে *লালসালু* উপন্যাসকে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় মাধ্যমিক তথ্য-উপাত্তের জন্য দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ধরনের গবেষণাগ্রন্থ, জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ, বিভিন্ন প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রবন্ধ, বক্তৃতা ইত্যাদির সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত তথ্যের উৎস নির্দেশ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে, গুণগত পদ্ধতিতে (qualitative method) গবেষণা প্রবন্ধটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রত্যয়গত আলোচনা ও তাত্ত্বিক কাঠামো

সংস্কৃত ধৃ ধাতু থেকে ধর্ম শব্দের উদ্ভব। এর অর্থ ধারণ করা। বাংলা একাডেমির ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে ধর্মের সংজ্ঞার্থ লেখা হয়েছে "বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি-বিধান"।[২] ধর্মের

ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে religion শব্দটি ব্যবহৃত হয়। রাইহান রাইন দেখিয়েছেন যে, ধর্ম কথাটি আমাদের অঞ্চলে *রিলিজিয়ন* শব্দটির সঙ্গে তুলনীয় ছিল না। আমাদের এখানে ধর্ম বলতে কেবল প্রার্থনা, ভক্তিভাব ও শাস্ত্রের অনুশাসনকে মান্য করাকে বোঝায়নি। জীবন যা-কিছুকে ধারণ করে ধর্ম বলতে তার সবটাকেই বোঝাতো। সংসার-ধর্ম, দয়াধর্ম, প্রেমধর্ম, সেবাধর্ম, শব্দের মাঝে এই ব্যাপকতাকে খুঁজে পাওয়া যায়।[৩] যেহেতু ভৌগোলিক অবস্থান, সমাজকাঠামো ও সাংস্কৃতিকচর্চার পার্থক্যের কারণে ধর্মের সংজ্ঞার্থের তারতম্য হতে পারে, তাই ধর্মের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায়ন করা সম্ভব নয়। তারপরও ধর্মের সংজ্ঞার্থ ও স্বরূপ সম্পর্কিত তাত্ত্বিক ধারণা নির্মাণে সচেষ্ট থেকেছেন সমাজবিজ্ঞানীগণ।

ধর্মের সমালোচনাকে কার্ল মার্কস সকল সমালোচনার ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর 'A contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right' প্রবন্ধে (১৮৪৪) বলেন:

> Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless condition"[4]

সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইম (১৮৫৮-১৯১৭) ধর্মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টোটেম, সেক্রেড বা পবিত্র, প্রোফেন বা অপবিত্রের ধারণাকে বিশ্লেষণ করেছেন। অনগ্রসর সমাজে ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে টোটেম। টোটেম বিশ্বাসে কোনো জনগোষ্ঠী বিশেষ প্রাণি বা বিশেষ গাছের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। "টোটেম কেবলমাত্র একটি নাম নয়, এটি একটি নকশা যেটি সেই বিশেষ জনগোষ্ঠীর চিহ্ন।"[৫] সেক্রেড হচ্ছে কোনো পবিত্র বস্তু বা বস্তুসমূহ যার ওপর মানুষ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করে এবং সেই সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। সেক্রেডকে কেন্দ্র করে প্রদত্ত ধর্মের সংজ্ঞার্থে ডুর্খেইম বলেন :

> A religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things, that is to say, things set apart and forbidden—beliefs and practices which unite into one single moral community called a church, all those who adhere to them.[6]

জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবার ধর্মের প্রত্যক্ষ সংজ্ঞার্থ প্রদান করেননি। তবে অতিপ্রাকৃত শক্তি যে সর্বজনীন এবং পূর্বের সকল সমাজে এটি বিদ্যমান ছিল সে বিষয়ে তাঁর লেখায় ইঙ্গিত প্রদান করেন।[৭] ওয়েবার সমাজে ধর্মের সঙ্গে অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কের ওপর জোর দিয়েছেন। বিশেষ করে অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্ককে দেখিয়েছেন।

এডওয়ার্ড বার্নেট টেইলর মনে করেন যে, ধর্ম উৎপত্তি হয়েছে আদিম সমাজে। স্বপ্ন. কল্পনা, মৃত্যু ইত্যাদির অর্থ খুঁজতে গিয়ে মানুষ ধর্ম সৃষ্টি করেছে।[৮] টেইলরে ১৮৭১ সালে দেওয়া সংজ্ঞার্থে বলছেন, ধর্ম হচ্ছে "The belief in Spritual Being".[৯] টেইলরের কথিত এই Spritual Being কে আত্মা বা প্রেতাত্মা হিসেবে অভিহিত করা যায়। এই ধরনের আত্মা, ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব, পিশাচ, দেবদূত ইত্যাদিতে বিশ্বাস করার নাম টেইলর দিয়েছেন সর্বপ্রাণবাদ বা Animism।

আর. আর. ম্যারেট মহাপ্রাণবাদ ও মনার প্রবক্তা। ম্যারেটের ব্যাখ্যায় "আদিম মানুষের পক্ষে আত্মার ধারণায় পৌছুতে হলে সর্বাগ্রে যে বিশ্বাস ও অনুভূতির প্রয়োজন তা হলো জড় বস্তুতে একটি নৈর্ব্যক্তিক অতিপ্রাকৃত শক্তির ধারণা আরোপ।"[১০] সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের দুটি

প্রধান অংশ রয়েছে। (ক) দৈহিক ও (খ) মনস্তাত্ত্বিক দিক । ধর্মীয় আচরণের সৃষ্টিকর্তার প্রতি নতজানু হওয়া এবং চোখ বন্ধ করে ধ্যান করার মধ্যে দৈহিকভাব প্রকাশিত হয়। মানুষ যখন ধর্মীয় বিশ্বাস ও ঐহিত্য অনুযায়ী অতিপ্রাকৃত সত্তার প্রতি তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করে, তখন ধর্মের মনস্তাত্ত্বিক দিক প্রকাশিত হয়।[১১]

সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন উপকরণ ও পদ্ধতি ব্যবহার করে মানুষের ধর্মবিশ্বাস, ধর্মচর্চার স্বরূপ, ধর্মের সাংগঠনিক রূপ ইত্যাদিকে পর্যবেক্ষণ ও পাঠ করা হয় জ্ঞানকাণ্ডের যে শাখায়, আমরা তাকেই বলতে পারি ধর্মের সমাজতত্ত্ব। এমনকি ধর্মের সমাজতত্ত্ব ও ধর্মের নৃতত্ত্ব ধর্মকে উপজীব্য করে প্রতিষ্ঠিত হলেও এই দুই জ্ঞানকাণ্ডের চর্চার বিষয় পুরোপুরি এক নয়। যেখানে ধর্মের নৃতত্ত্ব গুরুত্ব আরোপ করে ধর্মের সাংস্কৃতিক দিকের ওপর, সেখানে ধর্মের সমাজতত্ত্বে গুরুত্ব দেওয়া হয় ধর্মের সামাজিক ভূমিকায়। এ বিষয়ে সমালোচকের বিশ্লেষণ হল:

> The division of labour within the social sciences results in differences in focus, each discipline having its own emphasis on a particular aspect of religion. This will reflect on the definitions that are produced within a discipline. An example is the difference in approach in the sociology of religion and the anthropology of religion. Whereas sociologists will probably look for the social dimension of religion, characterizing religion by the way it is organized and practised, anthropologists tend to draw attention to religion as a cultural phenomenon, and to a certain degree connected with other aspects of culture such as politics, economics, economics, and of course the social.[12]

ধর্মের সমাজতত্ত্বকে বিশ্লেষণ করার জন্য তিনটি প্রধান তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এগুলো হল : ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতীকবাদী মিথস্ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি।

ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় যে, সমাজের বিভিন্ন অংশ এর স্থিতিশীলতা রক্ষায় ভূমিকা পালন করে। ধর্ম ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে। সমাজে বিভিন্ন ভূমিকা পালনের মাধ্যমে ধর্মও সমাজকে টিকিয়ে রেখেছে। ধর্ম সমাজের অনেক ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে। এটি মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ সৃষ্টি করে, সামাজিক ঐক্য ও স্থিতিশীলতাকে শক্তিশালী করে। আচরণের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে ধর্ম। এটি শারীরিক-মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে ভূমিকা রাখে এবং সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। সামাজিক সংহতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় ধর্ম সমাজে কার্যকর প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়া ধর্ম সরবরাহ করে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা। ধর্ম মানসিক শান্তি যোগান দেয়, ঐক্য সৃষ্টি করে, আত্মপরিচয় নির্মাণ করে। খারাপ কাজের প্রতি নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। হার্বার্ট স্পেন্সার, এমিল ডুর্খেইম ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে বিশ্লেষণ করেন। সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মতো ধর্মেরও সমাজে কিছু ক্রিয়ার (function) সঙ্গে অপক্রিয়া (disfunction) আছে। সমাজে স্থিতি ও ভারসাম্য রক্ষা, সামাজিক সম্প্রীতি ও বন্ধনকে দৃঢ় করা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করাকে যেমন ধর্মের ক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তেমনি ধর্মের অপক্রিয়ার মাঝে পাওয়া যায় সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ানো, ধর্মভিত্তিক ব্যবসা ও রাজনীতির চর্চা, ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষের উপর চাপ প্রয়োগ করা ইত্যাদি। এই তত্ত্বে

সমাজকে মনে করা হয় সংহত, সংগঠিত, স্থিতিশীল এমন এক ব্যবস্থা হিসেবে, যেখানে অধিকাংশ সদস্য মৌলিক মূল্যবোধ অক্ষুণ্ন রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে।

দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠী বা দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কার্ল মার্কস দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির তাত্ত্বিকগণ। দ্বন্দ্ব তাত্ত্বিকরা ধর্মকে এমন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখেন, যা অনেক ক্ষেত্রে বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখার বা ন্যায়সঙ্গত করার চেষ্টা করে। দ্বন্দ্ব তত্ত্বে মনে করা হয়, ধর্ম সামাজিক অসমতা সৃষ্টিতে যেমন ভূমিকা রাখে তেমনি সমাজে দ্বন্দ্ব সৃষ্টিরও কারণ হতে পারে। ধর্মীয় নের্তৃত্ব ও ক্ষমতা নিয়েও সমাজে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। আবার ধর্মকে ব্যবহার করে মানুষকে শোষণ করা হলে শোষিত ব্যক্তি তা মেনে নেয় পরলৌকিক বিচারের আশায়। ধর্মীয় ভেদাভেদের কারণেও সমাজে শত্রুতা ও সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। ধর্মকেন্দ্রিক এই বিষয়গুলো দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ সম্ভব। যেমন আশরাফ-আতরাফ কিংবা জাতি বর্ণ প্রথার ধারণা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ সম্ভব। নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের ব্যাখ্যাও দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্গত। কারণ প্রায় সকল সমাজে ও সকল ধর্মে নারী লিঙ্গ-বৈষম্যের শিকার হয়। এছাড়া ধর্মকেন্দ্রিক দাঙ্গা, ধর্মপ্রভাবিত যুদ্ধ, বিপ্লব প্রভৃতি দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সামাজিক আচরণসমূহকে বিশ্লেষণ করে। সমাজতত্ত্বে এ দৃষ্টিভঙ্গি প্রাথমিকভাবে ম্যাক্স ওয়েবার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল সমাজ মনোবিজ্ঞান এবং শিকাগো স্কুলের প্রথম দিকের তাত্ত্বিকদের কাজ দ্বারা, বিশেষভাবে জর্জ হার্ভার্ট মিডের দ্বারা। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্তি যে-ভাবে তার ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করে, তার উপায়গুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয় যে, কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস বা অনুশীলন আগে থেকেই পবিত্র থাকে না, এটি তখনই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে যখন মানুষ এর ওপর পবিত্রতার ধারণা আরোপ করে। মানুষ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পবিত্রতা আরোপ করতে পারে। একবার পবিত্র হিসেবে গণ্য হলে এগুলো বিশেষভাবে অর্থবহ হয়ে উঠে।

আলোচ্য এই তিন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি একই বিষয়কে বুঝার ক্ষেত্রে তিনটি ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে।

লালসালু ও ধর্মের সমাজতত্ত্ব

'লালসালু' উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে মজিদকে কেন্দ্র করে মজিদের জন্ম ও বেড়ে উঠা অঞ্চলকে উপন্যাসের শুরুতেই লেখক প্রতিভাসিত করেছেন "শস্যহীন জনবহুল"[১৩] অঞ্চল হিসেবে। ফলে এই এলাকার মানুষ জীবিকার সন্ধানে অন্য এলাকায় স্থানান্তরিত হয়। এরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নন। মক্তব-মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষা লাভের মাধ্যমে বড় হয়ে তারা জীবিকার্জনের জন্য দূরের কোনো গ্রাম বা শহরে চলে যায়। মজিদও প্রথমে মধুপুরের গারো পাহাড়ে একটি মসজিদের ইমামের দায়িত্ব নিয়ে জীবিকা নির্বাহের কাজ করে। কিন্তু সেখানে সে সুবিধা করতে না পেরে সে চলে যায় মহব্বত নগর গ্রামে। সেখানে নাটকীয়ভাবে গ্রামে প্রবেশ করে সে। মতিগঞ্জের সড়ক দিয়ে প্রবেশের পবিবর্তে বিলের বৃহৎ অশ্বত্থ গাছ থেকে নেমে আসে চমক সৃষ্টির জন্য। ফলে সহজেই সে গ্রামবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। আরও নাটকীয়ভাবে একটি অখ্যাত কবরকে সে মোদাচ্ছের পিরের মাজার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। মজিদ অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝতে পেরেছিল যে, গ্রামীণ বাংলার সাধারণ মানুষের মাঝে পির-ফকিরে বিশ্বাস প্রবল। অবশ্য এই প্রবল

বিশ্বাসের একটি ঐতিহাসিক ভিত্তিও বিদ্যমান। মুহম্মদ এনামুল হক এ বিষয়ে বিশ্লেষণ করেছেন যে, এই উপমহাদেশে মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তারের শুরুতেই রাজনীতির সঙ্গে ধর্মও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। রাজা-বাদশা ও তার সৈনবাহিনি যুদ্ধ-জয় করলেও, মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছিল মুসলিম মরমি সাধকগণ। বিশেষ করে মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের পূর্ব থেকেই সুফি সাধকদের আগমন হয়েছিল এখানে। সুফিদের মানবিক ধর্মীয় কর্মকাণ্ড মানুষের মাঝে তাঁদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ জাগাতে সমর্থ হয়েছিলেন।[১৪] বাংলার সুফিসাধকদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের এই মনস্তত্ত্বকে অনুভব করতে পেরেছেন মজিদ। ফলে কল্পিত কবরকে মোদাচ্ছের পিরের মাজার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে তাকে খুব বেশি কষ্ট করতে হয়নি।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ পিরদের যেমন আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন মনে করে, তেমনি পিরের কবরকেও মনে করা হয় পবিত্র স্থান। এমিল ডুর্খেইম-এর বিশ্লেষণে এই পবিত্র স্থানকে বলা হয় সেক্রেড বা পবিত্র। কোনো কিছুকে পবিত্র জ্ঞান করে শ্রদ্ধা করা মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কোনো পবিত্র স্থানকে অযত্নে ফেলে রাখার মধ্যে ডুর্খেইম কথিত প্রোফেন বা অপবিত্রতার ধারণার সঙ্গে মিলে যায়। মজিদ বোঝাতে সক্ষম হয় যে, গ্রামবাসী মাজারকে অপবিত্রভাবে ফেলে রেখেছে। তাই পাপবোধতাড়িত গ্রামবাসী মজিদকল্পিত সেই মোদাচ্ছের পিরের কবরটি লালসালুতে আবৃত করে দ্রুত মাজারে রূপান্তরিত করে।

সৃষ্টির শুরু থেকেই ভয় ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সমালোচকের ভাষায় বলা যায়:

> The expression 'fear of God' for religion is very significant: in early times it must have expressed the essence of religion, or at least its most important element.[15]

ধর্ম সৃষ্টি সঙ্গে মানবের ভয়ের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থেকেই সৃষ্টি হয়েছে ধর্মের ফিয়ার থিয়োরি (fear theory)। আঠারো শতকের ব্রিটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম তাঁর *Natural History of Religion* (১৭৫৭) গ্রন্থে দেখান যে, মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে ভয় পায়। প্রাকৃতিক শক্তিকে ভয় পায় বলেই সে ঈশ্বরকে ভয় পায়। কারণ মানুষ মনে করে ঈশ্বর প্রাকতিক শক্তিকে তার ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ফলে মানুষ বিশ্বাস করে ইশ্বরকে যদি মানুষ খুশি করতে পারে, তবে ইশ্বরও মানুষের প্রতি দয়াশীল হবে। জার্মান তাত্ত্বিক ম্যাক্স মুলারও এই ফিয়ার থিরোরিকে সমর্থন করেন। তিনিও মনে করেন যে, অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনায় মানুষ বিশ্বাস করে বলেই সে ভয় পেয়ে ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করে।[১৬]

লালসালু গ্রন্থেও আমরা লক্ষ করব 'ভয়' মজিদসহ মহব্বত নগরের অন্যান্য লোকজনের ধর্মকেন্দ্রিক জীবনাচরণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। সৈয়দ আকরম হোসেন দেখিয়েছেন যে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ *লালসালু*তে সত্তরবার 'ভয়' কিংবা ভীতি অনুষঙ্গবাহী শব্দ ব্যবহার করেছেন।[১৭] প্রশ্নহীনভাবে মজিদ কথিত কবরকে মোদাচ্ছের পিরের মাজার হিসেবে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রামবাসীর মাঝে কাজ করেছে পাপের ভয়। মাজারের প্রতি যেহেতু সাধারণ মানুষ ধর্মীয় কারণে বিশ্বাস স্থাপন করে, তাই মাজারে শায়িত মৃত ব্যক্তিকেও গ্রামবাসী ভয় পায়। তারা মনে করে মোদাচ্ছের পির যেহেতু সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি, তাই যেও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। আর মাজারের খাদেম হিসেবে সেই অলৌকিক ক্ষমতার কিছুটা হয়তো মজিদের ভেতরও আছে। এ কারণে গ্রামবাসীর সঙ্গে মজিদের স্ত্রী রহিমাও মজিদকে ভয় পায়:

> খোদাতা'আলার রহস্যময় দিগন্ত তার অন্তরে যেন বিদ্যুতের মতো থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। একটি অবক্তব্য ভীতিও ঘনিয়ে আসে মনে। সে খোদাকে ভয় পায়, মাজারকে ভয় পায়, স্বামী মজিদকে ভয় পায়।[১৮]

মজিদ নিজে জানে সে মিথ্যে মাজারের ভীতি দিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করছে। তাই তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সে কখনও কখনও ভয় পেয়েছে। সেই ভয় ছিল তার কথায় অন্যরা প্রভাবিত না হওয়ার ভয়। একারণে আওয়ালপুরের জাঁদরেল পিরের আগমনে সে ভয় পেয়েছে।[১৯] আবার নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য, নিজের ধর্মীয় অলৌকিক ক্ষমতার গল্প বলে গ্রামবাসীর মাঝে ধর্মভীতি এবং মজিদভীতি সচল রেখেছে। ধর্মের প্রতি ভয়কে জাগিয়ে রাখার জন্য মজিদ গ্রামবাসীর সমন্বয়বাদী ধর্মীয় সংস্কৃতিতে নিষোধাজ্ঞা জারি করে। ফলে মজিদের শাস্তির ভয়ে তারা মজিদের শেখানো ধর্মীয় সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ফলে "আজ তারা একত্র হয়ে খোদার কাছে দোয়া করে,– মাজারে শিরনি দেয়, মজিদকে দিয়ে খতম পড়ায়।"[২০]

মাজারকেন্দ্রিক ধর্মবোধ বা মাজারের প্রতি সম্মানবোধের কারণে মাজারে এসে মানুষ কাঁদতে পারে, কিন্তু ভয় থেকে মাজারে এসে কেউ হাসে না। এমনকি রহিমা মজিদের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও হাসে না।[২১] মাজার সম্পর্কিত গ্রামবাসীর এই ভীতি মজিদের ক্ষমতার কেন্দ্রে যাওয়ার হাতিয়ার হয়ে উঠে। কিন্তু মজিদের এই ক্ষমতাকেন্দ্রকে নেড়ে দেয় জমিলা। সে মাজারের পাশের ঘর থেকে শব্দ করে হাসে– যা দূর থেকেও শোনা যায়। মজিদ বুঝতে পারে জমিলার এই আচরণ অব্যহত থাকলে মাজার সম্পর্কে গ্রামবাসীর ভয় চলে যাবে। ফলে মজিদের মনে হয়, জমিলার হৃদয়ে গ্রামবাসীর মতো খোদার ভীতি নেই। আর এই ভয় না জাগাতে পারলে গ্রামবাসীও হয়তো ধীরে ধীরে তাকে আর ভয় পাবে না। তাই মজিদ পরিকল্পনা করে জমিলার মনে "পর্বতপ্রমাণ খোদার ভীতি জাগাতে হবে।"[২২] এই ভয় জাগানোর জন্য সে কৌশলে এমন গল্প বানিয়ে বলে যাতে মনে হবে মাজারের সত্যিই অলৌকিক ঘটনা ঘটে।[২৩] কিন্তু এত কৌশলেও যখন সে জমিলার মনে ধর্মভীতি জাগাতে পারে না, তখন মহব্বত নগর গ্রামে নিজের প্রভাব ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বেছে নেয় নিষ্ঠুরতার পথ। জমিলাকে সে প্রবল ঝড়-বৃষ্টির রাতে মাজারে আটকে রেখে মৃত্যুর ঝুঁকিতে ফেলে দেয়। বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর 'Why I Am Not a Christian' (১৯২৭) শীর্ষক বক্তৃতায় বলেন:

> Religion is based, I think, primarily and mainly upon fear. [...] Fear is the basis of the whole thing—fear of the mysterious, fear of defeat, fear of death. Fear is the parent of cruelty, and therefore it is no wonder if cruelty and religion has gone hand-in-hand.[২৪]

বাট্রান্ড রাসেলের উক্তি *লালসালু* উপন্যাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই গ্রন্থে মাজারকেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাসে আমরা মানুষের ভীতিকে চিহ্নিত করেছি। মাজারের রহস্যময়তাও গ্রামবাসীকে ভীত করে তুলেছে। ভয় থেকে যে মানুষ নিষ্ঠুর হয়ে যেতে পারে, তা আমরা পর্যবেক্ষণ করি মজিদ কর্তৃক জমিলাকে নির্যাতনের মাধ্যমে। মজিদ অবশ্য শুধু জমিলার প্রতিই নিষ্ঠুর হয়নি, ক্ষমতা হারানোর ভয়ে কৌশলে নিষ্ঠুর হয়েছিল খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী আমেনার প্রতিও।

দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও *লালসালু*তে প্রতিফলিত ধর্মের সমাজতত্ত্বকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি। কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস ধর্মকে আধিপত্যবাদী শ্রেণির মতাদর্শের উৎপাদ হিসেবে ভেবেছেন। তিনি মনে করতেন যে ধর্ম শোষকের আধিপত্যকে বৈধতা দান করে, শোষিত শ্রেণির প্রতি অধিপতিদের

নিপীড়িনকে মেনে নেওয়া শিখিয়ে জনগণের বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে ধুলিস্মাৎ করে দেয়। পরজগতে মুক্তির আশা-ভরসা প্রদানের মাধ্যমে ধর্ম ইহজগতের নিপীড়নকে মেনে নেয়ার আহ্বান জানায়।[২৫] মজিদ ধর্মকে ব্যবহার করে প্রাথমিকভাবে তার ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করলেও ক্রমশ শাসকে পরিণত হতে চেষ্টা করে। কোনো সমাজে ধর্মীয় বিশ্বাসের ভূমিকা শক্তিশালী হলে, ধর্মগুরুদের অন্তর্গত করা হয় অভিজাত শ্রেণিতে। ফলে ধর্মের ব্যাখ্যাদানকারী এই শ্রেণি ক্ষমতাবান ও সম্পদশালী হয়ে উঠে।[২৬] ধর্মকে ব্যবহার করে মজিদ এত বেশি ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে যে, গ্রামের মাতব্বর খালেক ব্যাপারীও গ্রাম্য সালিশে তার কথা মেনে নিতে বাধ্য হয়। মজিদের এই ক্ষমতাচর্চাই হাসুনীর বাপের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক তৈরি করে। মজিদের ক্রোধের শিকার হয়ে তাকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হয়। আক্কাসের স্কুল প্রতিষ্ঠাও মজিদ ঠেকিয়ে দেয় ধর্মকে ব্যবহার করে। ধর্মকে ব্যবহার করে মজিদ আমেনা বেগমের ওপরও প্রতিশোধ নেয়। কিন্তু মজিদের এসব চালাকি কেউ ধরতে পারে না। এসব ঘটনাকে আমরা কালর্স মার্কস দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি। মার্কস বলেছিলেন যে, ধর্ম আফিমের মতো মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। মহব্বতনগর গ্রামের ক্ষেত্রেও কালর্স মার্কসের উক্তির সত্যতা খুঁজে পাই।

অনেক সময় "সামাজিক জীবনে ঐকমত্যের পরিবর্তে ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘাত ক্রিয়াশীল"[২৭] হয়। জর্জ সিমেল দেখিয়েছেন যে, উভয়পক্ষের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একই পুরস্কার প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা দুই ধর্মীয় পক্ষের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে।[২৮] মজিদ ও আওয়ালপুরের পিরের মাঝে আমরা এরকম প্রতিযোগিতা দেখতে পাই। এই দুই পক্ষই চায়, সাধারণ জনগণ তাদেরকে অদ্বিতীয় ধর্মগুরু হিসেবে সম্মান করবে, প্রশ্নহীনভাবে তাদের আনুগত্য মেনে চলবে। তারা দুজনই জানে সাধারণ ধর্মভীরু মানুষকে তারা বোকা বানিয়ে বৈষয়িকভাবে লাভবান হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতার শুরু হয়েছে মজিদের সামাজিক অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে। মজিদের একচ্ছত্র আধিপত্য আওয়ালপুরের পিরের আবির্ভাবে খর্ব হয়ে যাচ্ছিল। তাই বাধ্য হয়ে মজিদ আওয়ালপুরের পিরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। প্রথমে সে গোপনে আওয়ালপুরে গিয়ে পিরের কার্যকলাপের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণের চেষ্টা করে। কিন্তু সেখানে ব্যর্থ হয়ে সে মহব্বত নগরের মানুষকে আওয়ালপুরের পিরের কাছে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় কৌশলে খালেক ব্যাপারীর স্ত্রীকে তালাক প্রদান করানোর ব্যবস্থা করে। মহব্বত নগরের মানুষকে আওয়ালপুরের পিরের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে। ফলে মজিদ নির্দেশ না দিলেও মজিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আওয়ালপুরের পিরকে লাঞ্ছিত করতে চলে যায় কিছু লোক এবং আওয়ালপুরের পিরের অনুসারীদের কাছে মার খেয়ে আহত হয়ে ফিরে আসে।

ডারেন ই. শেরকাট দেখিয়েছেন যে[২৯], স্বামী-স্ত্রী যেমন ধর্মবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে প্রভাবিত হন, তেমনি ধর্মের কারণে সমাজে ব্যক্তির অবস্থান-মর্যাদাও দাম্পত্য সম্পর্ক নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। এমনকি বিবাহিত যুগলের মধ্যে একজনের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় জীবনাচরণ দ্বারা অন্যজন প্রভাবিত হতে পারে। লালসালু উপন্যাসে ধর্মীয় কারণে মহব্বতনগর গ্রামে মজিদ সম্মানিত ব্যক্তির মর্যাদা পেয়েছিল বলেই সে রহিমাকে সহজেই বিয়ে করতে পেরেছে। রহিমা বিধবা ছিল। তাকে বিয়ে করা সহজ হলেও, জমিলার মতো অবিবাহিত কিশোরীকে বিয়ে করা মজিদের জন্য সহজ হতো না, যদি না সে মানুষের ধর্ম বিশ্বাসে আস্থা আনতে পারত। কিন্তু নিজের প্রভাবের মাধ্যমে বিয়ে করতে পারলেও স্ত্রীদেরকে মজিদ তার সহমর্মী বন্ধু হিসেবে ভাবেনি। তাদেরকে সে অনুগত, বাধ্য জীব হিসেবে কামনা করেছে।

মজিদের এই চিন্তার প্রেক্ষাপটের কারণ ধর্মের পুরুষতান্ত্রিক পক্ষপাত। পুরুষের প্রতি সমাজের এই পক্ষপাতকে বিচার-বিশ্লেষণ করা ধর্মের সমাজতত্ত্বের অন্যতম দিক। এ বিষয়ে সমালোচক বলেন:

> The final area of interest for sociologists of gender and religion has been religious masculinities.[৩০]

সমাজবিজ্ঞানীরা 'ধর্ম'কে যেমন সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করেছেন, তেমনি একে সমাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম বাহন হিসেবেও বিবেচনা করেছেন।[৩১] আর ধর্মকে প্রয়োগ করে এই নিয়ন্ত্রণ বেশি লক্ষণীয় নারীর ওপর। সমাজ ও ধর্মের পরিচালক হিসেবে বিভিন্ন যুগে পুরুষের কর্তৃত্বই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে।[৩২] আনু মুহাম্মদ বিশ্লেষণ করে দেখান যে, নারীর অধীনতাকে পাকাপোক্ত করার ক্ষেত্রে পুরুষ বিভিন্ন ধর্মীয় বিধি-বিধানের আশ্রয় নিয়েছে। তারপরও সবসময় সকল নারীর ওপর পুরুষ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে একইভাবে কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারেনি। নিপীড়ন-দমনের ফলে অনেক নারীই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।[৩৩] আমাদের আলোচ্য উপন্যাসে রহিমা কিংবা আমেনার মতো নারীরা ধর্মীয় বিধি-নিষেধের বেড়াজালে দমিত কিংবা অপমানিত হয়েছে। অপরদিকে প্রতিবাদী নারী হিসেবে জমিলা ধর্মীয় বিধি-বিধানের অজুহাতকে অস্বীকার করেছে। কিশোরী জমিলাকে মজিদ ধর্মের নানা বিধি-নিষেধ দিয়ে তার বাধ্য করে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু জমিলা মজিদের অন্যায় ও ভণ্ডামির মর্মমূলে আঘাত করেছে তার অবাধ্য হয়ে, তার মুখে থুথু দিয়ে এবং চূড়ান্তভাবে মুমূর্ষু অবস্থাতেও মাজারের গায়ে পা তুলে দিয়ে। আমেনার প্রতি অবিচার যেমন ধর্মনির্ভর সমাজের মানুষের কাছে সহানুভূতি পায়নি, তেমনি জমিলার প্রতিবাদও সমাজের বৃহত্তর অংশের সমর্থনশূন্য থেকেছে ধর্মীয় আবেগের কারণে।

নিনিয়ান স্মার্ট ধর্মের সাতটি মাত্রার (dimension) কথা উল্লেখ করেছেন। ৩৪ এগুলো হল 1. Practical and ritual dimension, 2. Experiential and emotional dimension, 3. Narrative and Mythic dimension, 4. Doctrinal and philosophical dimension, 5. Ethical and legal dimension, 6. Social and institutional dimension, 7. material dimension.

এই সাতটি ডাইমেনশনের মধ্যে পাঁচটি ডাইমেনশন দিয়ে আমরা *লালসালু*কে বিশ্লেষণ করতে পারি: এগুলো হল:

Practical and ritual dimension: আরাধনা, প্রার্থনা ইত্যাদি ধর্মীয় আচারের দিক। *লালসালু* গ্রন্থে আমরা গ্রামের মানুষকে নামায পড়া, জিকির করা, প্রার্থনা করা প্রভৃতি ধর্মীয় আচারে যুক্ত থাকতে দেখি।

Narrative and Mythic dimension: জগতের ব্যাখ্যায় মিথের প্রভাব থাকে। যেমন: নুহের প্লাবনের ঘটনা। লালসালু উপন্যাসে লক্ষণীয়, মহব্বতনগরের মানুষ শিলাবৃষ্টি হলে বিশ্বাস করে "শয়তানকে তাড়াবার জন্যই তো শিলা ছোঁড়ে খোদা।"[৩৫]

Ethical and legal dimension: ধর্ম নৈতিকতার ধারক ও বাহক হিসেবে স্বীকৃতি পেতে চায়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রচলিত আইন ও নৈতিকতার ধারণায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। মানুষ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি এতো বেশি আস্থাশীল হয়ে উঠে যে, মনে করা হয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কখনও অনৈতিক বাণী প্রচার করতে পারে না। ফলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তৈরি করা আইন ও নৈতিকতা

মানুষের মাঝে বিশেষ মূল্যবোধ তৈরি করে। ফলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তৈরি করা বাণীই আইন হয়ে যায়। *লালসালু* উপন্যাসে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মাজারের খাদেম হওয়ার কারণে মহব্বতনগর গ্রামে মজিদের কথাই জনগণের কাছে আইনের মতো মান্য হয়ে উঠে। মজিদের তৈরি করা নৈতিকতা দিয়ে মানুষ প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়। ফলে আক্কাসের স্কুল চালু করার সময়, কিংবা খালেক ব্যাপারীর স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার সময় গ্রামের মানুষ মজিদের অনৈতিক আদেশকে নৈতিকভাবে মেনে নেয়।

Social and institutional dimension: সমাজের অন্যতম অংশ হচ্ছে ধর্ম। শিশু থেকে বড় হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধর্ম মানুষকে বিশেষ পরিচয় দান করে। ফলে মানুষ বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান প্রভৃতি পরিচয়ে বড় হয়ে উঠে। ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই পরিচয় একই পরিচয়ে বড় হওয়া আরেকজন মানুষের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করে। ফলে মহব্বতনগরে মজিদ আগন্তুক হলেও ধর্মের পরিচয়ের মাধ্যমে গ্রামবাসীর আপন হয়ে ওঠে।

material dimension: ধর্মগুলো যখন কোন নির্দিষ্ট দালানকে পবিত্র মনে করে কিংবা কোনো গ্রন্থকে পবিত্র মনে করে– যেমন: মসজিদ-মন্দির-কোরআন-বাইবেল, তখন তা হয়ে ওঠে ধর্মের ম্যাটেরিয়াল ডাইমেনশন। আর এইসব পবিত্র বস্তুগুলো নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিত্বের সঙ্গেও যোগ হয় পবিত্রতা, তাদের বাণীও হয়ে ওঠে পবিত্র। *লালসালু* গ্রন্থে মহব্বতনগরের সাধারণ মানুষের প্রবল ধর্মবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে মজিদও তার সম্পদ ও ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি করতে থাকে। মজিদ মাজারের খাদেম, ও সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন লোক। তাই মজিদের স্থান যেমন সমাজের উচ্চকোটিতে, তেমনি তাকে সবাই সমীহ করে, ভয় পায়। ফলে গ্রামের সাধারণ এক ব্যক্তির কাছে মজিদ জানতে চায় যে, সে ব্যক্তি জমি থেকে কেমন ধান উৎপাদন করতে পেরেছে, তখন লোকটি উত্তর দেয় "যা-ই হইছে তাই যথেষ্ট। ছেলেপুলে লইয়া দুই বেলা খাইবার পারুম।"[৩৬] এই গ্রামের লোকজন ফসল তোলার সময় প্রাপ্ত ফসলের চেয়েও বাড়িয়ে বলে গর্ববোধ করে। "কিন্তু মজিদের সামনে বড়াই করা তো দূরের কথা, ন্যায্য কথাটা বলতেই তার মুখে কেমন বাধে। তাছাড়া, খোদার কালাম জানা লোকের সামনে ভাবনা কেমন যেন গুলিয়ে যায়। কী কথা বললে কী হবে বুঝে না উঠে সতর্কতা অবলম্বন করে।"[৩৭] অর্থাৎ মোদাচ্ছের পিরের মতো মজিদকেও গ্রামবাসী বিশেষ শক্তির অধিকারী হিসেবে ভাবতে শুরু করে।

মহব্বতনগর গ্রামবাসীদের কিছু আচরণে আমরা বাংলার সমন্বয়বাদী লৌকিক ধর্মের পরিচয় পাই। মাইকেল পাই ধর্মীয় সমন্বয়বাদকে বলেছেন, "বিভিন্ন ধর্মীয় উপাদানের সাময়িক দ্বৈত সহাবস্থান এবং অন্যান্য বিষয়সমূহের সহধর্মীয় চিত্র"।[৩৮] মহব্বতনগরের সাধারণ মানুষ মাটিকে তাদের আত্মীয়জ্ঞান করে; কারণ মাটি থেকে ফসল হয়, আর সেই ফসল তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু মজিদ এদের মাঝে ভয় সঞ্চার করতে চায়। তাই সে বলে, "মাঠভরা ধান দেখে যাদের মনে মাটির প্রতি পূজার ভাব জাগে তারা ব্রত-পূজারী। তার গুনাগার।"[৩৯] এই মাটির প্রতি পূজার ভাবের মধ্যে আমরা ধর্মচর্চার একটা সমন্বয়বাদী ধারা লক্ষ করি। মুহাম্মদ এনামুল হক দেখিয়েছেন যে, বাংলায় ইসলাম প্রচারের পূর্বে এখানে বৌদ্ধ ও হিন্দুরা বাস করত বলে, মুসলমানরা বাংলার ক্ষমতায় আসার পর সুফিদের আগমনের ফলে হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের নানান সাংস্কৃতিক উপাদান ইসলামি সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যায়। মুহম্মদ এনামুল হক এর নাম দিয়েছেন লৌকিক ইসলাম। এদেশের বা

বিদেশাগত মুসলমান অনেক সময়ে হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করেছে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে, তাদের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে। ফলে উভয় ধর্মাবলম্বী পরস্পরের আচার-ব্যবহার ও বিশ্বাসের অনুকরণ করেছে।[৪০] *লালসালু* উপন্যাসে এই ধর্মীয় সমন্বয়ের ফলে সৃষ্ট সংস্কৃতির চিহ্ন পাই সাধারণ মানুষের মাঝে। মজিদ এই গ্রামে আসার "আগে শিলাবৃষ্টির ভয়ে শিরালিকে ডাকত আর শিরালি যপতপ পড়ে নগ্ন হয়ে নাচত, [..] ধান ভানতে ভানতে মেয়েরা সুর করে গান গাইত, বিয়ের আসরে সমস্বরে গীত ধরত [...]।"[৪১]

আলোচ্য উপন্যাসটিতে আমরা গ্রামীণ মানুষের জীবনাচরণে সমন্বয়বাদী ধর্মসংস্কৃতি যেমন লক্ষ করি, তেমনি লোকবিশ্বাসে সর্বপ্রাণবাদের মিল খুঁজে পাই। উপন্যাসে খালেক ব্যাপারীর শ্যালক ধলা মিঞা আওয়ালপুরের পিরের পানিপড়া আনতে ভয় পায়, কারণ তাকে অনেক রাতে যেতে হবে একটি তেতুল গাছের নিচ দিয়ে। "সবাই জানে যে সেটা সাধারণ গাছ নয়, দস্তুরমতো দেবংশী।"[৪২] তাছাড়া "রাতের অন্ধকারে দেবংশী তেঁতুলগাছটা কী যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, ভাবতেই বুকের রক্ত শুকিয়ে আসে।"[৪৩] ভূত-প্রেত-আত্মায় বিশ্বাস করা ও ভয় পাওয়ার মাঝে আমরা টেইলর কথিত সর্বপ্রাণবাদের চিহ্ন দেখি। এভাবে ধর্মবিশ্বাস, ধর্মকেন্দ্রিক ভীতি, ধর্মনির্ভর ক্ষমতা কাঠামো, ধর্মাশ্রিত জীবিকা, ধর্মীয় সংস্কৃতি ইত্যাদির তাৎপর্যপূর্ণ চিত্রায়ণ লক্ষ করা যায় *লালসালু* উপন্যাসে।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর *লালসালু* গ্রন্থে যে সমাজকে রূপায়িত করেছেন, তা ধর্মের সমাজতত্ত্বের মাধ্যমে বিশ্লেষণযোগ্য। উপন্যাসটির ঘটনাপ্রবাহ, চরিত্রের অন্তর্গত ও বহির্গত কার্যকলাপ, ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা প্রতীকী মিথষ্ক্রিয়াবাদের মতো সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটেও বিশ্লেষণ করা সম্ভব। Fear theory of religion প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা দেখেছি যে, ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভয়ের যেমন সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি ধর্মনির্ভর সমাজে ব্যক্তির জীবনাচরণ ও মনস্তত্ত্ব নির্ধারণেও ভয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। ধর্মের নারীবাদী প্রেক্ষাপট থেকে আমরা লক্ষ করেছি, *লালসালু* উপন্যাসে চিত্রিত নারী ধর্মীয় নানা বিধি-নিষেধে আবদ্ধ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রভাবে এরা দমন ও পীড়নের শিকার। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী সাধারণ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবনাচরণ ও বিশ্বাসে ধর্মীয় সংস্কৃতির সমন্বয়বাদী চিত্রও পরিলক্ষিত হয়। সামগ্রিকভাবে *লালসালু* উপন্যাসকে ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করে আমরা এই গ্রন্থে একজন সমাজচিন্তাবিদ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে আবিষ্কার করি। এ কারণে বলা যায়, নন্দনতাত্ত্বিক গুরুত্বের পাশাপাশি, ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক দিকের অনবদ্য চিত্রায়ণের কারণেও *লালসালু* বাংলাদেশের সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. C. N. Shankar Rao, *Sociology* (New Delhi: S. Chand and Company Ltd, 2012, seventh revised edition) p. 35

২. মুহম্মদ এনামুল হক, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০২০), পৃ. ৬৩৯

৩. রায়হান রাইন (সম্পা.), ভূমিকা, *বাংলার ধর্ম ও দর্শন* (ঢাকা: সংবেদ, ২০০৯), পৃ. ৮

৪. qouted from André Droogers, "Defining Religion: A Social Science Approach", *The Oxford Handbook of the Sociology of Religion,* (edited by : Peter B Clarke, online published sep 2009), p. 5

৫. রেহনুমা আহমেদ ও মানস চৌধুরী, *নৃবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ* (ঢাকা: একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২০০৩), পৃ. ২৭৭

৬. Émile Durkheim, *The Elementary Forms of the Religious Life* (London: George Allen and Unwin, 1976), 47.

৭. রেহনুমা আহমেদ ও মানস চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৮

৮. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *নৃবিজ্ঞানের রূপরেখা* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৪), পৃ. ১২৮

৯. Edward Burnett Tylor, *Primitive Culture: Researches into the Deveopment of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and custom,* Vols. 2 (London: john Murray, 1958), p. i. 8

১০. মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩

১১. রঙ্গলাল ও বিশ্বম্ভর কুমার নাথ, *প্রারম্ভিক সমাজজিজ্ঞান* (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৪), পৃ. ২৭৭

১২. André Droogers, op. cit, p. 6

১৩. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, *লালসালু*, *উপন্যাসসমগ্র: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্* (ঢাকা: প্রতীক, ২০০৮, হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত), পৃ. ৩

১৪. মুহাম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী-প্রভাব*, (ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০১৫), পৃ. ১৮-৪০

১৫. R. H. Pfeiffer, "The Fear of God", *Israel Exploration Journal,* vol 5, No. 1, 1955, p.42

১৬. C. N. Shankar Rao, op. cit, p. 418

১৭. সৈয়দ আকরম হোসেন, "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস: প্রসঙ্গ ভয়", *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৭), পৃ. ৮২

১৮. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

১৯. তদেব, পৃ. ২৪

২০. তদেব, পৃ. ৪৬

২১. তদেব, পৃ. ৫০

২২. তদেব, পৃ. ৫৪

২৩. তদেব, পৃ. ৬০

২৪. See the link, https://users.drew.edu/~jlenz/whynot.html

২৫. রেহনুমা আহমেদ ও মানস চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪

২৬. Gaetano Mosca, Arthur Livingstone, ed. *The Ruling Class*, translated by Hanna D. Khan (New York: McGraw-Hill, 1939), pp. 50-54, 56-62, 65-66

২৭. এ.এফ. ইমাম আলি, *সমাজতত্ত্ব* (ঢাকা: ইনস্টিটিউট অব অ্যাপলায়েড অ্যানথ্রোপলজি, ১৯৯৮, চতুর্থ সংস্করণ), পৃ. ১১২

২৮. Georg Simmel, *Conflict and the Web of Group-Affiliations* (New York: Free Press, 1950, trans by Reinhard Bandix.), p. 57

২৯. Darren E. Sherkat, "Religious Socialization: Sources of Influence and Influences of Agency", *Handbook of the Sociology of Religion* (New York: Cambridge University Press, 2003, Edited by Michele Dillon), p.157

৩০. Orit A Vishal, Afshan Jafar, Rachel Rinaldo, "A Gender Lens on Religion", *Gender and Society,* February 2015, Vol 29, No. 1, (published by: Sage Publication), p. 10

৩১. রঙ্গলাল সেন ও বিশ্বম্ভর কুমার নাথ, পূর্বোক্ত, পৃ.২৭৫

৩২. মালেকা বেগম, *নারীমুক্তি আন্দোলন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬), পৃ.১৬

৩৩. আনু মুহাম্মদ, *সময়, সমাজ ও মানুষ* (ঢাকা: সংহতি, ১৪১৮), পৃ. ২৩

৩৪. Ninian Smart, *The World's Religions,* (New York: Cambridge University Press, 1989), p. 12-21

৩৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৩৬. তদেব, পৃ.২৪

৩৭. তদেব

৩৮. উদ্ধৃত, মাসাহিকো তোগাওয়া, 'বাংলার সাধুসঙ্গ ও ধর্মীয় সমন্বয়বাদী ঐতিহ্য', *ভাষা-সাহিত্যপত্র*, ৪৪তম সংখ্যা, ২০১৮, পৃ. ২৫

৩৯. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৪০. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী-প্রভাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১-১৪৩

৪১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬

৪২. তদেব, পৃ. ৩১

৪৩. তদেব, পৃ. ৩২